ভারতবর্ষে খ্রীস্টান মিশনারি: সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

মৌসুমি মণ্ডল [1*]

[1*]নব বারাকপুর প্রফুল্লচন্দ্র মহাবিদ্যালয়, শিক্ষাবিভাগ, Mail Id: mousumisumi6@gmail.com

সারসংক্ষেপঃ সব বিষয়ে পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে থাকা আমাদের ঔপনিবেশিক দাস্যগিরির দৃষ্টান্ত। ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান মিশনারিদের আগমনের মূল উদ্দেশ্য ধর্মপ্রচার হলেও এদেশে শিক্ষা বিস্তারের কাজে তাদের অবদানের ব্যাপারে পাশ্চাত্যের দান স্বীকার করতেই হবে। এই লেখার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে খ্রীস্টান মিশনারিদের আগমন এবং খ্রীস্টীয় তত্ত্বের উদ্ভবের ওপর আলোকসম্পত করা হয়েছে। এছাড়াও পর্তুগীজ ও প্রোটেস্টান মিশনারিদের আগমন এবং ভারতবর্ষকে খ্রীষ্টীয়করন করবার জন্য তাদের লক্ষ্য বা কর্মসূচী বিবৃত হয়েছে। আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গে পরিচয়ের ফলে সমগ্র ভারতবর্ষেই যুগোপযোগী নতুনত্বের প্রভাব সঞ্চারিত হয়। তাই ভারতে পাশ্চাত্য জাতির অভিযান সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

সূচক শব্দঃ সিরিয়া -উত্তরাধিকার, সেন্ট থমাস, জেসুইট- মিশন , সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার, মুঘল মিশন, পর্তুগীজ মিশন, মাদুরাই মিশন, প্রোটেস্টান মিশন, জুলিয়াস রিকটার

ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয় তত্ত্বের উদ্ভবের পশ্চাতে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। একটি অনুসারে ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয় চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেন্ট থমাসের হাত ধরে, যিনি যিশুর ১২ জন অনুগামীদের মধ্যে অন্যতম। অপর একটি দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ভারতবর্ষে খ্রীস্টধর্ম এসেছিল পূর্ব সিরিয়া এবং পার্শ্বীয় চার্চের অনুগামী খ্রীষ্টীয় বনিক ও মিশনারিদের হাত ধরে। কিন্তু সর্বসম্মত ভাবে এটাই বিশ্বাস করা হয় যে সেন্ট থমাসের কর্মোদ্যোগের ফলেই খ্রীস্টধর্মের প্রচার হয়। কার্ডিনাল টিসারেন্ট (Cardinal Tisserant) এর বক্তব্য অনুসারে সেন্ট থমাস সর্বপ্রথম ধর্মান্তকরনের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। বিশেষত দক্ষিণ ভারতে খ্রীষ্টীয় যুগের ঊষালগ্নে পশ্চিম এশিয়া থেকে পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যপদ বিদ্যমান ছিল। [১] স্থলপথে বাণিজ্যিক পথটি পৌঁছেছিল কেরল এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে। ভারতবর্ষে খ্রীস্টধর্ম প্রচারে সহজতম পদ্ধতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই দুই প্রক্রিয়া। মালাবারে ইহুদি সম্প্রদায়ের বাসস্থান এবং বাণিজ্যিক যোগসূত্র তাঁর ধর্ম প্রচারের যাত্রাপথকে সুগম করেছিল। আধুনিক তাত্বিকরা সেন্ট থমাসের ধর্মতত্ব প্রচারের ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণ করেছেন বিভিন্ন নথিপত্রের সূত্র ধরে। [৩]

মালাবারের খ্রীষ্টধর্ম প্রচার সংক্রান্ত গল্পগুলি ভারতবর্ষে খ্রীষ্ট সম্প্রদায় ও পার্সীয় চার্চে উজ্জ্বল সম্পর্কের উত্তরাধিকার বহন করে মালাবারে বসবাসকারী ভারতীয় খ্রীস্টানরা সিরিয়া খ্রীস্টান মতে বিশ্বাসী ছিলেন। ঐতিহাসিক তথ্য ও জনশ্রুতি থেকে মনে হয় ইউরোপে পোঁছাবার আগেই খ্রীষ্টান ধর্ম ভারতে প্রবেশ করেছিল শোনা যায় সেন্ট থমাসের কাছে প্রায় একহাজার লোক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। ব্রাহ্মন পুরোহিতরা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে কালীমন্দিরে বলি দিয়েছিলেন এরকম জনশ্রুতি আছে। খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে কিছু সিরিয়া খ্রীষ্টান মালাবারে এসে ডেরা বাঁধে। তাঁদের নেতা ছিলেন আর এক টমাস, এডেসার বিশপ। বহু শতাব্দী ধরে মালাবার অঞ্চলেই খ্রীষ্টধর্ম সীমাবদ্ধ ছিল। N.E.B এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছেঃ

“ The Origin of Christians of St. Thomas are uncertain through they seem to have been in existence before the 6th century AD and probably derive from the missionary activity of

East Syrian (Nestorian) church ……..Despite their geographic isolation, they retained the children liturgy and Syrian language and maintained fraternal ties with the Babylonian patriarch: their devotional practices also included Hindu religious symbolism vestiges of Syrian Christians to their early religion".

সেন্ট থমাসের প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়টি সময়ের সাথে বিলুপ্ত হয়ে যায় এটি পুনরায় সংগটিত ও সুসংবদ্ধ হয় পার্সীয়া থেকে আগত একদল খ্রীস্টান সম্প্রদায় দ্বারা। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সংযোগটি ঘটেছিল চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে। মালাবারের রাজা সেন্ট থমাস সম্প্রদায়কে প্রচুর জমিদান করেছিলেন, এছাড়াও রাজকীয় অভীবা উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। খ্রীস্টানরা বনিক সম্প্রদায়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। যারা মালাবার উপকূলে (কেরালা) বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে তারা দক্ষিণ ভারতে উপকূলীয় অঞ্চলে জাত কাঠামোয় 'ওয়েনাস' (waniers) এবং কামালারস্ (kammalers) এবং বৈশ্যদের থেকে তুলনামুলক ভাবে উচ্চস্থানে বিরাজ করত। যেভাবে সামন্ত প্রভু তাঁদের অধস্তনদের উপর প্রভুত্ব করে।

মানুষ সবসময় সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশের বশবর্তী হয়ে চলে কেউই এই সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছাড়া চলতে পারে না। জীবনের সাফল্য বিশেষত ধর্মীয় জীবন নির্ভর করে একটি মানুষ বা সম্প্রদায় কীভাবে সেই পরিবেশকে আত্তীকরণ করে। এটা খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও সত্য। এর গুনগত এবং পরিমাণগত বৃদ্ধি নির্ভর করে সেই **সময়ের সামাজিক সাংস্কৃতিক ভিত্তি ভূমির উপর।**

খ্রীষ্টীয় শতকের প্রথম দশক এবং তারও পূর্বে মালাবার ছিল একটি "Museum of race & cultures" মালাবারের প্রাচীন অধিবাসীরা ছিল দ্রাবিডিয়ান তাঁদের নিজস্ব ধর্মীয় আচার বিধি বিদ্যমান ছিল। মনে করা করা হয় ব্রাহ্মণরা মালাবারে অনুপ্রবেশ করে ৩০০-৮০০ খ্রীঃপূঃ মধ্যে এবং তারা পরিচিত হয় 'নাম্বকুদ্রি' নামে। নায়াররা ছিল সামাজিক মাপকাঠিতে নাম্বুদ্রিদের নীচে এবং তারা ছিল মালাবারের শাসক ও সামরিক সম্প্রদায়। বাকী সবাই ছিল নিচু শ্রেণীভুক্ত। মালাবারের প্রধান বা মূল ধর্ম ছিল হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম। খ্রীষ্টীয় শতকের সূচনাকালে যখন সেন্ট থমাস সম্প্রদায় নিজেদের ধর্মীয় এবং সামাজিক আচরণ বিধি তৈরির ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত করেছিল। জাতিভেদ প্রথা জর্জরিত হিন্দু সামাজিক ব্যবস্থা এবং প্রাচীন হিন্দু প্রথা বিভিন্ন দিকের সঙ্গে মিলিত হয়ে তারা এখনকার ভূমিপুত্রে পর্যবসিত হয়েছিল। আরেকটি বিশেষ কারন যে ধর্মান্তরিত লোকেদের মধ্যে বেশিরভাগ ছিল উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মন সম্প্রদায়। হিন্দু ধর্মের এই উত্তরাধিকার তাদেরকে শুধুমাত্র সমাজে উচ্চ প্রতিষ্ঠাই দান করেনি। বরং ধর্মীয় জীবন এবং আদর্শের একটি রূপদানও করেছিল। সেন্ট থমাস খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মালাবারের সংস্কৃতিক পরিবেশকে আত্তীকরণের প্রতি Brown মন্তব্য করেছেন যে -

" Syrian Christian Community, foreign in origin, put down such deep roots in Indian Soil that it became accepted without question as indigenous a position hardly yet attained by Christian church which are the fruit of European Christian missionary movement of the nineteenth Century."

সেন্ট থমাস খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবন সম্পর্কে খ্রীষ্টীয় ষষ্ট শতাব্দীতে বিষদ বিবরণ পাওয়া যায়। L.W Brown, A.M.Mundadan এবং placid. j. podippara দের উপরিউক্ত বর্ণনায় পূর্বেই বলা হয়েছে যে বেশিরভাগ মানুষ যারা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন তারা এসেছিল ব্রাহ্মন এবং উচ্চ সম্প্রদায় থেকে সেই জন্য সামগ্রিক ভাবে দেখা যায় যে মালাবারের সামাজিক জীবন চর্চায় খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়রা উচ্চশ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেদের থেকে খুব একটা পৃথক নয়। আচার আচরণের দিক থেকে খুবই নিকট। তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রথা অনুসরণ করত।

নবজাতক শিশুকে খাওয়ানো হত মধু ও স্বর্ণচূর্ণ। এই প্রথাটি ছিল একান্ত ভাবে ব্রাহ্মনদের। ওল্ড টেস্টামে বা নিউ টেস্টামেন্ট থেকে শিশুটি একটি ডাকনাম পেত যা ছিল দেশীয় বিশেষ করে হিন্দু নাম। Synod of Diamper নিষেধ করেছিলেন এই ধরনের আচরণ করতে।

চার বছর বয়সে প্রথম অক্ষর জ্ঞান লাভ করত হিন্দু গুরুর থেকে। পরবর্তীকালে স্থানীয় বিদ্যালয় তাঁকে পাঠান হত। সেন্টঃ থমাস ধর্ম সম্প্রদায় তৎকালীন কেরলে প্রচলিত শিক্ষা ববস্থাকেই অনুসরণ করত। Placid.J.Podippara বলেছিলেন যে যদিও গুরুরা ছিলেন হিন্দু তবুও তারা সেন্ট থমাস সম্প্রদায়ের সন্তানদের খ্রীস্ট ধর্মপোমনা এবং Catechism -শিক্ষা দিতেন। তারা দেশীয় বিভিন্ন উৎসব ওনাম বা নববর্ষে যোগদান করত।

পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইতিহাসে ইতিহাসে খুব গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিম ইউরোপের জাতি গুলির দ্বারা সামুদ্রিক অভিযানের মাধ্যমে নতুন দেশ আবিস্কারের জন্য। এর ফলে আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়ায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের সূচনা হয়। 1948 খ্রীঃ ভাস্কো- ডা-গামা কালিকট বন্দরে পৌঁছলেন মশলা বাণিজ্যের জন্য। জলিয়াস রিকটার বলেছেন; পর্তুগীজদের অবতরন একটি নতুন যুগের সূচনা পর্ব। ভারতবর্ষে এর ফলেই রোমান ক্যাথেলিক মিশনের যুগ শুরু হয়। পর্তুগীজ সম্রাট মনে করতেন এই ধর্ম প্রচারক সমর্থন করা তাঁর পবিত্র কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। পর্তুগীজরা মনে করত ভারতীয় খ্রীষ্টানদের জীবন বিভিন্ন দিক থেকে নিকৃষ্ট মানের ছিল। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় খ্রীস্টানদের পর্তুগীজ আচরণ ও মতামত দ্বারা পরিচালিত করা। পূর্বদেশীয় খ্রীষ্টানদের প্রতি পশ্চিমের ধারণা ছিল যে তা প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধবাদী। এই দ্বন্দ্ব আরও তীব্র হল যখন সেন্ট থমাস সম্প্রদায়ের উপর তাঁদের যাজোকীয় অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইল। ভারতবর্ষীয় খ্রীষ্টানরা মনে করত নিজের কর্মের দ্বারা নিজের উদ্ধার লাভ সম্ভব। কিন্তু পর্তুগীজরা এই প্রবাদকে সঠিক বলে মনে করত না। পর্তুগীজরা ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পক্ষপাতী ছিল না , Fairth বলেছেন -

" In the eyes of the Hindus Christianity was the religion of the 'franks or parangir' the term used to denote especially the Portuguese but also any kind of European. It was not a Complimentary term, it suggested meat-eating, wine drinking, loose -living, arrogate persons, whose manners were so far removed from Indian propriety that social intercourse with them was unthinkable. 9

এইভাবে পর্তুগীজ ও সেন্ট থমাসের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ মালাবার উপকূলের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

1540 খ্রীঃ পর্তুগীজরা পশ্চিম উপকূলের গোয়া এবং Ganganore এবং কোচিনে তাঁদের মিশন স্থাপন করেন। পর্তুগালের রাজা তাঁর রাজত্বকালের মধ্যে খ্রীষ্টান বিশপদের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি পোপ এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত খ্রীষ্টীয় সমাজের কাছে মিশনারিদের ভারতে আসার জন্য আর্জি জানিয়েছিলেন। ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রথম এই জন্য নির্বাচিত হন।। তিনি প্যারিসে শিক্ষা লাভ করেন এবং 1541 খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষে পর্তুগীজ প্রভাব বিস্তারের জন্য প্রেরিত হন। এইভাবে ভারতে জেসুইট মিশন শুরু হয়। ফ্রান্সিস জেভিয়ার এই ধর্মপ্রচারে গুরুত্বপূর্ণ বলে আলোচিত। তিনি দরিদ্র ও নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তির সাহস যুগিয়ে বিপদের মোকাবিলা করতে শিখিয়েছেন। খ্রীষ্টীয় বানীকে চারিদিকে প্রচার করাই ছিল তাঁর প্রধানতম লক্ষ্য। ভারতে বহু জায়গায় বিদ্যালয় স্থাপন করে জেভিয়ার শিক্ষার প্রবর্তনে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন।

সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার জেসুইট মিশনের মাধ্যমে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার করলেও এই লক্ষ্য সঠিক ভাবে পূরণ করা হয়নি। যতক্ষণ না পর্যন্ত রবার্ট দি নোবিলি তামিলনাড়ুর মাদুরাই মিশনের দায়িত্বে আসেন। তিনি এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর সমস্যা ছিল এই যে খ্রীস্টধর্মকে তিনি

হিন্দুদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চেয়ে ছিলেন। কিন্তু সেন্ট পলস্ তাঁকে বলেন ধর্মমত প্রচারের সময় উদ্দিষ্ট জন গোষ্ঠীর সভ্যতা সংস্কৃতি আত্তীকরণ একান্তভাবে জরুরী। নোবিলি সংস্কৃত ভাষায় উল্লেখযোগ্য দক্ষতা অর্জন করেন এবং মাদুরাইের ব্রাহ্মন পণ্ডিতদের সঙ্গে একটি ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এই সভায় তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্মমতকে ঔপনিবেশিক চিন্তার আলোকে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেন। যদিও রিকটারের মতে, নোবিলির মতবাদ ফ্রান্সিস জেভিয়ারের বিপরীত মেরুতে অবস্থিত ছিল। রোমের কর্তৃপক্ষ নোবিলিকে তাঁর ধর্মপ্রচারের পদ্ধতি পরিহারে বাধ্য করে এবং তিনি হিন্দু আচার বিচারের দ্বারা খ্রীস্ট ধর্ম মতকে দুষিত ও কলঙ্কিত করেছেন এই অভিযোগ আনা হয়েছিল। এরপর থেকে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি সম্পর্কে একপ্রকার অসহিষ্ণুতাই খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারকদের ধর্ম প্রচারে মূল বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দু আচার রীতিনীতির সঙ্গে কোন প্রকার আপোষ নিষিদ্ধ হয়। উদাহরণ স্বরূপ গোমাংস ভক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। কারন তা ধর্মান্তরিতদের স্থায়ীভাবে হিন্দু ধর্মের থেকে নির্বাসিত করে দেয়।

খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় তৈরির উদ্দেশ্যে সম্রাট আকবর তাঁর সভায় খ্রীস্টান পণ্ডিতদের আমন্ত্রন জানান, তাঁদের যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে সাদরে গ্রহণ করা হত। এবং তারা সম্রাটের সঙ্গে গভীর ধর্ম আলোচনায় অংশগ্রহণ করত। এই সকল ধর্মালোচনা থেকে এটা পরিস্কার হয়ে যায় যে আকবর তাঁর নিজস্ব ধর্মমত দিন-ই-ইলাহি প্রচারে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। কারন এই ধর্মমত ছিল বিভিন্ন ধর্মের উৎকৃষ্ট উপাদানগুলির মধ্যে সমন্বয়। জেসুইটরা এই ব্যাপারে যথেষ্ট অসহিষ্ণু প্রদর্শন করে ছিল। ঐতিহাসিক পানিক্কর লিখেছেন, - মিশনারিদের অন্য ধর্মমত প্রচারকদের সম্পর্কে উদ্ধত অবজ্ঞা সম্রাটের বিরাগ উৎপন্ন করেছিল। এবং এই কারণে মিশনারিরা হতাশ হয়ে রাজধানী ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ৮

প্রথম থেকেই খ্রীষ্টধর্ম ভারতবর্ষের মাটিতে সাধারন ভাবেই অন্যান্য ভারতীয় ধর্মের ন্যায় গৃহীত হয়েছিল। 1653 খ্রীঃ Coonen Cross Oathকোচির কাছে মতনচেরিতে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তা খ্রীস্টীয় সম্প্রদায়ের দুটি দলে বিভক্তিকরনকে সুনিশ্চিত করেছিল। পর্তুগীজদের ধর্মপ্রচার সংক্রান্ত কাজকর্ম ভারতবর্ষে একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল যেখানে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করত। যদিও পর্তুগীজ মিশনারিরা ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে মিশনারি কাযে পথপ্রদর্শক ছিলেন কিন্তু তাঁদের প্রতিষ্ঠান এতই আগ্রাসনমূলক ছিল যে তা যিশুখ্রীষ্টের মতামত দ্বারা সমর্থিত হওয়া সম্ভব ছিল না। মিশনারি কাজে এবং যাজকীয় উন্নতিতে পর্তুগীজদের এই ক্ষমতা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যেতে থাকল যখন থেকে তারা ক্ষমতা হারাতে শুরু করেছিল। ডাচ্ এবং ব্রিটিশ যারা বাণিজ্যের জন্য ভারতবর্ষে এসেছিল তারা ছিলেন প্রোটেস্টান বা প্রতিবাদী ধর্মের অনুরক্ত কাথেলিকদের কাজ কর্মের প্রতি তাঁদের কোন সহানুভূতি ছিল না। সুতরাং প্রথম পর্বের ধর্মান্তকরন প্রক্রিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়েই ক্ষয়িষ্ণু হতে হতে একেবারে সমাপ্তির পথে পৌঁছে যায়। যেভাবে পর্তুগীজরা উপমহাদেশে তাঁদের রাজকীয় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল।

এটা সত্যি যে উনিশ শতকে প্রোটেস্টান মিশনারি ষোড়শ শতাব্দীতে রোমান ক্যাথেলিক চার্চের মতই ঔপনিবেশিকতাবাদী পতাকা বহন করত। ঔপনিবেশিক এবং খ্রীষ্টীয় চার্চের আগমন হাতে হাত মিলিয়ে ভারতবর্ষে আগত হয়েছিল। পর্তুগীজদের আগমন কাল থেকে এটা এক ধরনের সমঝোতা। কারন খ্রীস্টধর্ম পাশ্চাত্য ধর্ম হিসাবে ভারতবর্ষে পশ্চিমে ক্ষমতাকে রাজনীতিকরনে সাহায্য করেছিল। মিশনারিদের কাজকর্ম, বাণিজ্য এবং সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। খ্রীষ্টীয় মিশনারিদের প্রতি ভারতবর্ষে শিক্ষিত মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুভূতির একটি নির্ভরযোগ্য চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের এই উক্তিতে -

"In Bengal, Where the English are rulers, and where the mere name of English man is sufficient to frighten people, an encroachment upon the rights of her poor, timid and humble inhabitants and upon their religion, can not be viewed in the eyes of God or the public as a justifiable act." ৯

অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকের বেশিরভাগ মিশনারিরা এবং কিছু ঐতিহাসিকগণ বিশ্বাস করতেন ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষে ঈশ্বর এবং কুসংস্কার সংক্রান্ত ধারণাকে জ্ঞানের পথে উত্তোলিত করবে। ইউরোপীয় মিশনারি ইতিহাসে পরাধীন জাতিরা 'বর্বর', 'অসভ্য', 'মূর্তি পুজারক', 'কুসংস্কারক হিসাবে অভিহিত হতেন। এই সূত্র ধরে বলা যায় যে, যদিও মিশনারিদের উদ্দেশ্য ছিল খ্রীস্টধর্ম প্রচার কিন্তু তারা পরাধীন মানুষদের ইউরোপের সংস্কৃতির আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে সুসভ্য করতে চাইতেন। ইউরোপিয়ান ও ভারতীয়দের মধ্যেকার দ্বৈত পার্থক্যকে কেন্দ্র করে শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গ, সুসভ্য বনাম আদিম, খ্রীস্টান এবং মূর্তি পূজারক এই মতামতকে কেন্দ্র করে ইউরোপীয়রা ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিকতাবাদ এবং ধর্মান্তকরন প্রক্রিয়াকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। 1793 সালে হাউস অফ কমনসের সদস্য উইলিয়াম উইলবার ফোর্স ভারতীয়দের সম্পর্কে বলেছিলেন - ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান ক্ষীণ। দেশীয়দের একটি উচ্চতর ধর্ম এবং ব্যবহার বিধিতে শিক্ষিত করা আবশ্যক। তাহলে তারা রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্পর্কে ইচ্ছা প্রকাশ করবে।

ভারতবর্ষে প্রথম প্রোটেস্টান মিশন আসে ডেনমার্কের রাজা চতুর্থ ফেডারিকের সহায়তায়। তিনি ছিলেন লুথারিয়ান মতবাদের উৎসাহী সমর্থক। দক্ষিণ ভারতে ট্যাঙ্কবারে প্রথম ড্যানিশ বসতি স্থাপিত হয়। প্রথম দুইজন মিশনারি যারা ভারতবর্ষের মাটিতে পা রেখেছিলেন তারা হলেন সম্রাট প্রেরিত Ziegenbalg এবং Plutrchau. 9th July, 1706 সালে। জুলিয়াস রিকটারের মতে এই দিনটি হল ভারতবর্ষে প্রোটেস্টান মিশনের জন্মদিন। তাঁদের ধর্মপ্রচার সংক্রান্ত কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল মূলত তামিলনাড়ু অঞ্চলে। Anglican রা ক্ষমতায় আসার পরই তাঁদের ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

ভারত ও দূরপ্রাচ্যে বাণিজ্যের জন্য ১৬০২ খ্রীঃ অব্দে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে অবলম্বন করে নেদারল্যান্ড সংযুক্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হল এবং বাটাভিয়ায় তাঁদের সুদৃঢ় কেন্দ্র স্থাপিত হলে ভারতে পর্তুগীজ শক্তির শঙ্কার কারন দেখা দিল। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে চেন্নাইয়ের নিকট পুলিকটে প্রথম ওলন্দাজ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। অতঃপর প্রাচ্যের মশলা ও গন্ধ দ্রব্যের বাণিজ্য তাঁদের একচেটিয়া অধিকার স্থাপিত হল এই প্রসঙ্গে ভারতে বাণিজ্য বিস্তারে উৎসুক দিনেমার বাণিজ্যের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৬১৬ সালে দিনেমার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি স্থাপিত হয় এবং ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দে চেন্নাইয়ের পূর্ব উপকূলে ট্রাংকোবরে তাঁদের প্রথম কুটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৭৫ খ্রীঃ কোলকাতার নিকট শ্রীরামপুরে ও তাঁদের কেন্দ্র ও শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদেরই প্রেক্ষাপটে ১৮০০ সালে কেলির নেতৃত্বে শ্রীরামপুর মিশন স্থাপিত হয়। ১৮৪৫ সালে শ্রীরামপুরের দিনেমার কেন্দ্র ইংরেজদের কাছে বিক্রয় করার পর ভারত থেকে দিনেমার বাণিজ্য ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়ে যায়। ১০

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একটি সাধারন ধারণা করা যায় এদেশে মিশনারিদের আগমন সম্পর্কে। এই আগমনের সাথে তাঁদের অবদানের কথা উল্লেখ না করলে আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যায় বলে মনে হয়। তাই খুব সংক্ষিপ্ত আকারে তাঁদের এদেশে শিক্ষাবিস্তারের কথা আলোচনা করা হল। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার শুরু হয়েছিল পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামার পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে। সেই সময় উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ভারতে জনশিক্ষার দায়িত্ব কোম্পানি পরিপূর্ণ ভাবে স্বীকার করার মধ্যবর্তী সময়ে

(1854 উডের ডেসপ্যাচ পর্যন্ত) বিদেশী মিশনারি গন এই উপমহাদেশে শিক্ষা বিস্তারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা গ্রহণ করেন। আবার এই ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতে জনশিক্ষা বিস্তারের জন্য অপর একটি শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে তা হল দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তি ও সমাজ সংস্কারক এবং উদারচেতা ইংরেজদের পারস্পরিক সহযোগিতায় দেশে জনশিক্ষা বিস্তার। এইসব ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষ ভাবে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও, ডিঙ্কওয়াটার বেথুন প্রমুখ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের প্রচেষ্টায় কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে এই যে ত্রিমুখী শক্তি (মিশনারি, সরকারি ও দেশীয় প্রচেষ্টা) দেশে জনশিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল তাঁদের মধ্যে সহমতের অভাব ছিল। যেমন - মিশনারিদের উদ্দেশ্য ছিল - নাগরিকদের ধর্মান্তরিত করা ও খ্রীষ্ট ধর্মের প্রচার করা। সরকারের উদ্দেশ্য ছিল - দেশের জনগণকে সন্তুষ্ট রেখে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা কায়েম রাখা, প্রশাসনের জন্য উপযুক্ত কর্মচারী তৈরি করা। দেশীয় শক্তির উদ্দেশ্য ছিল - পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে দেশবাসীর মনের অন্ধকার দূর করা, সমাজ সংস্কারের পথকে সুগম করা। এই অবস্থার মধ্যে মিশনারিরাই সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছিল। কারন এই সময় দেশীয় খ্রীস্টানদের খুবই দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়।, শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের প্রচেষ্টাকে ছোট করা যায় না। তাদের প্রচেষ্টায় ভারতে বিভিন্ন স্থানে ভালো ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। যার মান ছিল যথেষ্ট উন্নত। যা আজও তাদের সেই পুরাতন গৌরব নিয়ে আজও টিকে আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, 'চার্চ মিশনারি সোসাইটি'র কথা যারা বর্ধমানে 10 টি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 1820 সালে শিবপুরে 'বিশপ কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। আকেজান্ডার ডাফ কোলকাতায় 'জেনারেল এসেমব্লিজ ইন্সটিটিউশন' প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষার ইতিহাসে মিশনারিদের অবদান অল্প কথায় ব্যাখ্যা করার নয়। যেটুকু না বললে নয় সেটুকু বলার চেষ্টা করা হল শুধু মাত্র।

সূত্র নির্দেশঃ

১. E. Tisserant, Eastern Christianity in India London: Orient Longman, 1957 Pg - 10
২. A.M Mundadan, History of Criminality in India Vol. 1 (Bangalore: Theological Publications in India)1982 Pg - 21
৩. Tisserant, op. cit: Pg - 10
৪. অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পঞ্চমখণ্ড মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা- ২০০৯ -১০ pg - ৫১
৫. The New Encyclopedia Britannica (NEB) VOL- 3 15TH Edition 1997, Pg - 281
৬. L.W. Brown. Op. cit: Pg - 167
৭. C.B. Firth . op : Pg - 111
৮. K.M.Panikkar. asia and western Dominance (London : George Allen & Unwin Ltd, 1974 Pg - 280)
৯. T.V.Philip, " Christianity In India During western colonisation: conflict, Reconcilation or adjustment" ICHR VOL XXI No.I June 1987 Pg - 16
১০. অসিত কুমার বন্দ্যেপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত পঞ্চমখণ্ড, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা- (২০০৯-১০) pg - ৫৫